1990

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

মধ্যপ্রাচ্য সংকটের ইসলামী সমাধান

হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ)
ইমাম ঃ বিশ্ব আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত

প্রকাশনায় :
প্রকাশনা বিভাগ
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪, বক্‌শী বাজার রোড,
ঢাকা-১২১১

মূল খুতবা : হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ)
ইমাম : বিশ্ব আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত

অনুবাদক : মাওলানা আবদুল আউয়াল খান চৌধুরী,
সদর মুরব্বী

প্রথম প্রকাশ (পুস্তিকাকারে) ৫,০০০ কপি
অক্টোবর, ১৯৯০

মুদ্রণে : আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস
৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

Madhya Prachya Sankater Islami Samadhan
Based on a Friday sermon
delivered on 17-8-90 at the London Fazal Mosque by :
Hazrat Mirza Tahir Ahmad, Khalifatul Masih Rabe (atba)

ভূমিকা

আমাদের প্রাণ প্রিয় কা'বা মসজিদুল হারাম আজ ইহুদী ও খৃষ্টান সেনাবাহিনী দ্বারা বেষ্টিত। আজ থেকে চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে আব্রাহার খৃষ্টান বাহিনী বায়তুল্লাহ আক্রমণ করতে এসে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছিল। এবার খৃষ্টান বাহিনী এসেছে কা'বা ধ্বংস করার ঘোষণা দিয়ে নয় বরং সৌদী রাজত্বকে রক্ষা করার জন্যে। ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের কুয়েত দখল দেখে বাদশাহ্ ভীত হয়ে তার মিত্র আমেরিক যুক্ত রাষ্ট্রকে ডেকে এনেছেন সাহায্যের জন্যে। এখন প্রশ্ন হল,

- ইরাক কি কা'বা ধ্বংস করবে?
- ইহুদী-খৃষ্টান কি কা'বা রক্ষা করবে?

এই প্রশ্ন আজ প্রতিটি মুসলমানের। তেমনি আরো প্রশ্ন — এজন্যে কে দায়ী? এমন ঘটনা কেন ঘটল? এথেকে উত্তরণের উপায় কি? কে দিবে পথের দিশা? এ সম্বন্ধে পবিত্র কুরআন কি বলে?

বিশ্ব আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহ্‌মদ (আইঃ) সম্প্রতি তাঁর খুতবায় এ সম্বন্ধে সঠিক আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেছেন, মুক্তি একমাত্র কুরআন অনুসরণের মধ্যেই নিহিত। ইরাক এবং অন্যান্য মুসলিম দেশ-গুলো যদি পবিত্র কুরআনে নির্দেশিত পথে চলে তা'হলেই

এ বিপদ কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। সকল কল্যাণ একমাত্র কুরআনেই নিহিত।

এই খুতবা নানা ভাষায় অনূদিত হয়ে সমগ্র বিশ্বে প্রচারিত হবে। আরবীতে বাদশাহ ফাহ্‌দ এবং সাদ্দাম হোসেনের কাছেও পৌঁছাবে, ইনশাআল্লাহ্‌। আমরা বাংলা ভাষায় এই মূল্যবান ভাষণটি বাংলাদেশের জনগণ বিশেষ করে মুসলমান ভাইদেরকে উপহার দিলাম।

আল্লাহ্‌তা'লা মুসলমান ভাইদেরকে পবিত্র কুরআনের নির্দেশিত পথে চলার সৌভাগ্য দান করুন, আমীন!

খাকসার
আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী
সেক্রেটারী, প্রকাশনা বিভাগ,
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত
বাংলাদেশ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মধ্যপ্রাচ্য সংকটের ইসলামী সমাধান

(ইমাম জামা'তে আহ্‌মদীয়ার জুমুআর খুতবা)

ইসলামী শিক্ষার আলোকে উপসাগরীয় সংকটের অবসান ঘটাতে হবে ঃ

যদি মুসলিম দেশসমূহ কুরআনের শিক্ষার পরওয়া না করে, তবে তারা আল্লাহ্‌র ক্রোধ থেকে বাঁচতে পারবে না।

ইরাকের কর্তব্য ঃ বিদেশী সৈন্য মোতায়েনের বিরোধিতা করার সাথে সাথে ইসলামী বিশ্বের সমন্বিত ফয়সালা মেনে নেয়ার ঘোষণা দান করতে হবে।

ইসলামী-বিশ্বের ক্ষতি সব সময় নিজেদের অনৈক্যের কারণেই হয়েছে।

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-কে আল্লাহ্‌ প্রদত্ত এক ঐশী সংবাদের প্রেক্ষিতে আমি আরব বিশ্বকে এই নসিহৎ করছি ঃ

মধ্যপ্রাচ্যের সংকটজনক পরিস্থিতি ঃ

মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি দিন দিন খারাপ হয়ে চলেছে। যেহেতু প্রায় সমগ্র এলাকাটি মুসলমানদের, তাই স্বভাবতঃই পৃথিবীর সব মুসলমান অবশ্যই এ ব্যাপারে উদ্বিগ্ন। বিশেষ করে, মুসলিম দুনিয়ার সবচেয়ে প্রিয় স্থানদ্বয় — পবিত্র মক্কা এবং মদিনাও আজ বিপদ ও ষড়যন্ত্রের সম্মুখীন। এ কারণে আজ সমস্ত ইসলামী বিশ্ব গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। এর মাঝে, সবচেয়ে বেশী উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের। কেননা আজ দুনিয়াতে ইসলামের সত্যিকার ও নিষ্ঠাবান প্রতিনিধিত্ব-কারী জামা'ত কেবল জামা'তে আহ্‌মদীয়াই। আমার এ উক্তির কারণে অনভিজ্ঞ লোকেরা ভাবতে পারে যে, এটি একটি অলীক গর্ব এবং একটি নিছক দাবী মাত্র, যা অন্যান্য মুসলিম সম্প্রদায়কে "ক্রোধান্বিত" করবে। তারা মনে করতে পারেন যে, কেবল এরাই ইসলামের অগ্রদূত আর 'ঠিকাদার' বনে বসেছে, আর অন্যেরা যেন ইসলামের জন্যে কোন দরদই রাখে না! তবে আজ আমি আপনাদের সামনে পরিস্থিতির যে বিশ্লেষণ উপস্থাপন করবো তদ্বারা একথা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হবে যে, আজকের দিনে সত্যিকার অর্থে যদি কোন জামা'ত ইসলামের দরদ রাখে তবে সেটি হচ্ছে আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত।

তাক্‌ওয়া শূন্য রাজনীতি ঃ

বর্তমান কালের রাজনীতি নোংরা, ন্যায়বিচারশূন্য ও তাক্‌ওয়াহীন হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে সব মুসলিম রাষ্ট্র আজ

ইসলামের নামে বড়াই করছে, প্রকৃতপক্ষে তাদের কর্মকাণ্ড ইসলামী শিক্ষা বা ন্যায়-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। বরং তারা নিজ স্বার্থ উদ্ধারে সচেষ্ট। এ জন্যে ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন কার্যক্রম ও পদক্ষেপে স্ববিরোধিতা লক্ষ্য করা যায়। আজ একমাত্র আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত ছাড়া, মুসলমানদের অন্যান্য সব ফিরকা কোন না কোন ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে সম্পৃক্ত এবং নিজ সমর্থনের লক্ষ্যে কোন না কোন মুসলিম দেশকে অবলম্বন করছে। অথচ 'তাক্‌ওয়া' কেবল ইসলামী শিক্ষার সমর্থন করতে শিখায়। ইসলামের জন্যে অকৃত্রিম ভালবাসা থাকলে, কেবল ইসলামের স্বার্থ, কুরআনের স্বার্থ, সুন্নতে-রসূল (সাঃ)-এর স্বার্থ উদ্ধারে নিষ্ঠাবান হওয়া উচিত। এবং এই শিক্ষার আলোকে আমরা যদি বর্তমান রাজনীতির পর্যালোচনা করি, তবে দেখতে পাই যে, মুসলমানদের ও অন্যদের (পাশ্চাত্যের) উভয়ের রাজনীতির ভিত্তি হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-এর শিক্ষা থেকে অনেক দূরে। অন্য জাতিগুলো ইনসাফের (ন্যায় বিচার) বড় বড় বুলি আওড়াচ্ছে। মনে হচ্ছে, যেন তারাই পৃথিবীতে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্যে মনোনীত। তারা মনে করে, তাদের ও তাদের শক্তি ছাড়া পৃথিবী থেকে ইনসাফ উঠে যাবে! আবার মুসলমান দেশগুলিও ইসলামের নাম নিয়ে বড় বড় দাবী করছে। কিন্তু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে, পরিলক্ষিত হবে যে, উভয় পক্ষে কুরআন কর্তৃক পেশকৃত ইনসাফের অভাব ও শূন্যতাই বিদ্যমান।

আমি এখন ঘটনার বিবরণ দিতে চাই — ইরাক একটি বিবাদের কারণে প্রতিবেশী ছোট্ট একটি মুসলিম দেশ কুয়েতের উপর হামলা চালায় এবং বাকী দুনিয়া অবহিত হওয়ার আগেই অতি দ্রুত তাকে সম্পূর্ণভাবে দখল করে নেয়। এর ফলশ্রুতিতে সারা পৃথিবীতে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হয়। এমন কি যারা এই একই ধরণের ঘটনায় পূর্বে কোন প্রকার দুঃখ বোধ করে নি, যারা একই রকমের অবৈধ দখলের বিরুদ্ধে মোটেই আলোড়ন অনুভব করেনি, তারাই হঠাৎ ন্যায়নীতির নামে অভূতপূর্ব সাড়া জাগানো সাহায্য নিয়ে দখলকারীর বিরুদ্ধে কেবল এগিয়েই আসে নি বরং এমনভাবে কুয়েতের জন্যে তাদের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করছে, যার নজীর সমসাময়িক দুনিয়ার ইতিহাসে পাওয়া যায় না। এর পরের ঘটনাপ্রবাহ সম্বন্ধে আমি বেশী আলোকপাত করতে চাই না। কেননা যারা সংবাদ-পত্র পড়েন তারা জানেন যে কি হচ্ছে। কিন্তু এই ঘটনায় ইসলামের স্বার্থ বা ইসলামী ন্যায় বিচারের প্রতি কতটুকু লক্ষ্য রাখা হচ্ছে এবং সেই সঙ্গে বর্তমানের রাজনীতি কতখানি ইন-সাফশূন্য, তা তুলে ধরবার জন্যে, বিশ্ব-বিবেকের কাছে, বিশেষ করে মুসলিম-বিশ্বের কাছে কয়েকটি কথা উপস্থাপন করতে চাই।

আমেরিকা এবং তার সঙ্গীরা যখন ইরাক সরকারের বিরুদ্ধে কার্যক্রম আরম্ভ করে, তখনই প্রতীয়মান হয় যে, এই বড় ইসলামী দেশটি এমন এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে চলেছে, যার মোকাবিলা করা তার সাধ্যের বাইরে। সে

কারণে আমার দুশ্চিন্তাও বাড়তে থাকে এবং গভীর ভাবে আমি লক্ষ্য করতে থাকি, কি ধরণের কথাবার্তা হচ্ছে আর কি ধরণের সমাধান প্রস্তাব করা হচ্ছে। ক'দিন আগে জর্দানের বাদশাহ হোসেন যুক্তরাষ্ট্র সফরে যান। প্রথমে ধারণা করা হয়েছিল যে, তিনি কোন চিঠি নিয়ে যাবেন। পরে জানা গেল যে, পত্র নয় তিনি কিছু পয়গাম এবং কিছু প্রস্তাবাদি নিয়ে গেছেন। রেডিও এবং টেলিভিশনের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ও ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন সাহেব, একে অপরের বিরুদ্ধে যে ভাষা ব্যবহার করেন এবং যেসব অপবাদ দেন, তাথেকে পরিস্থিতির সঙ্গীনত্ব আন্দাজ করা যায় এবং এও আন্দাজ করা যায় যে, বড় বড় দেশের রাষ্ট্রপ্রধানগণ স্বাভাবিক ভদ্রতা বিসর্জন দিয়ে কি ধরণের বাজে কথা বলতে পারেন। তাদের বিবৃতি শুনে অবাক লাগে যে, একে অপরের প্রতি কি নোংরা ভাষা তারা ব্যবহার করতে পারেন। মিথ্যাবাদী, চরিত্রহীন, ধোকাবাজ প্রভৃতি অশালীন শব্দ পর্যন্ত ব্যবহৃত হচ্ছে। আর এ সব কিছুরই কারণ, একটি ছোট মুসলিম রাষ্ট্রকে একটি বড় মুসলিম দেশ দখল করে নিয়েছে।

কেন এই ঘটনার গুরুত্ব অসাধারণ ?

পৃথিবীতে এ ধরণের বহু ঘটনা এর চেয়ে অনেক ভয়ঙ্কর আকারে সংঘটিত হয়ে চলেছে। সেগুলোর মত এই ঘটনাও (কুয়েত দখল) একটি ঘটনা মাত্র। নিঃসন্দেহে, অনেকগুলি অন্তর্নিহিত কারণে এই ঘটনাটিকে অসাধারণ ও

অতিমাত্রায় গুরুত্বসহ বর্ণনা করা হচ্ছে। দখল সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। এখন তা আত্মস্থ করার পালা। চারিদিকে ভীষণ প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে। যার কারণে ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন সাহেব যুক্তরাষ্ট্রকে বল্লেন, "তুমি যদি সত্যি সত্যিই ইনসাফ চাও, তাহলে গোলযোগপূর্ণ গোটা অঞ্চলেই ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তাহলে, আমরা আমাদের ভ্রাতৃপ্রতিম রাষ্ট্রের সাবেক সরকারকে পুনর্বহাল করতে প্রস্তুত। যে রাজবংশ ইতিপূর্বে রাজত্ব করছিল, তার হাতে ক্ষমতা ফেরৎ দিব, আগের মত স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে। তবে, এই অঞ্চলে একই ধরণের অনেক অবৈধ দখল রয়েছে, যা তোমাদের তদারকী ও সমর্থনপুষ্ট। তোমরা তাদেরকেও অবৈধ দখল থেকে অপসারণ কর। যেমন, জর্দানের পশ্চিম তীর ইহুদীদের দখলে রয়েছে, দিন দিন তারা তাদের দখলকে আরও পাকাপোক্ত করে চলেছে। এখন সেখানে রাশিয়ান ইহুদীদের এনে বসতি স্থাপন করান হচ্ছে।" ইরাক আরও বলেছে, "ঐ এলাকাটিও পরজাতির দখলে বরং এমন পরজাতির দখলে যারা স্বধর্মী তো নয়ই বরং এমন পরজাতি যাদের সঙ্গে আরবদের চরম শত্রুতা বিদ্যমান। সেই অবৈধ দখলকে তারা স্থায়ীরূপ দিয়ে চলেছে অথচ তোমাদের পাশ্চাত্যের মানবতাবোধ ও তোমাদের ন্যায়-নীতিবোধ এ বিষয়ে কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে নি। সে সময় পাশ্চাত্যের ইনসাফের গায়ে আঁচও লাগে নি। তাই, এই সমস্যাটিকেও সমাধানের জন্যে অন্তর্ভুক্ত কর। আবার

লেবাননের বিষয়েও সমাধান প্রয়োজন। সিরিয়া সেখানে সৈন্য প্রেরণ করে এবং নিজের রাজত্ব বানায়। যখন খুশী তখন বার বার লেবাননে সৈন্য প্রেরণ করে আর যা ইচ্ছে তাই করায়। তাকেও নিষ্ক্রান্ত করতে হবে। সেই সাথে তার সৈন্যদেরকেও লেবানন থেকে ফেরৎ আসতে বাধ্য করতে হবে। এ ধরণের যে সব সমস্যাদি এই এলাকায় বিদ্যমান সেগুলোকে একসঙ্গে মিলিয়ে সমাধানের চিন্তা ভাবনা করা উচিত।" সাদ্দাম হোসেন সাহেবের এই কথাগুলো অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। ইনসাফের কথা বলতে হলে, এই এলাকার এ সমস্ত ঘটনাবলীকে একত্রে মিলিয়ে দেখতে হবে।

এ প্রসঙ্গে আরও কিছু বিষয় রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তাক্-ওয়া এবং ইনসাফের দৃষ্টিতে দেখলে সাদ্দাম হোসেন সাহেবের কুয়েত আক্রমণের কোন বৈধ কারণ নেই। তবে ইতিমধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ইহুদীদের জর্ডানের পশ্চিম তীরে স্থায়ী দখল তার চেয়েও বেশী অবৈধ। এ ছাড়া আরও কিছু অনাচার পাশ্চাত্যের প্রতি আরোপ করা যাবে। যেমন, পাশ্চাত্যের সংবাদ মাধ্যমগুলো ফলাও করে খবর প্রচার করে যে, এক ইংরেজকে কুয়েত ত্যাগ কালে সীমান্তে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। এটি একটি ঘটনা। পক্ষান্তরে, লেবানন কিংবা ইস্‌রাঈল অধিকৃত অন্যান্য অঞ্চলে ইহুদীরা ক্রমাগতভাবে যে কত হত্যা ও অত্যাচার করেছে তার ইয়ত্তা নেই! আবার, ইহুদীদের উড়োজাহাজ ইরাকেরই আণবিক প্লান্টগুলোর উপর

নির্লজ্জের মত দিনে দুপুরে আক্রমণ চালিয়ে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে — এই সব ঘটনায় পাশ্চাত্য জগৎ ভ্রুক্ষেপও করে নি; প্রতিবাদে টু শব্দটি পর্যন্ত করে নি; একদিকে একটি মানুষ মারা পড়েছে আর অমনি সমস্ত পৃথিবীর টেলিভিশন, রেডিও এবং সংবাদ পত্রে হৈ চৈ আরম্ভ হয়ে দিয়েছে যে, অত্যাচারের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। অপরপক্ষে, ক্যাম্পে অসহায় অবস্থায় পড়ে থাকা হাজার হাজার আবাল-বৃদ্ধ-বণিতাকে যখন বধ করা হয়, যখন ছোট বাচ্চাদের মাথা পাথরের উপর আছড়িয়ে আছড়িয়ে ফাটানো হয়, আর্তনাদকারী মায়েদের চোখের সামনে যখন তাদের বাচ্চাদের জবাই করা হয়, তারপর সেই মায়েদের উপর অকথ্য নির্যাত চালানো হয় তখন কিন্তু তারা দেখে না বা শুনে না। লেবাননের একটি আশ্রয় ক্যাম্পে অবাঞ্ছনীয় নর হত্যা যজ্ঞের একটা দানবীয় ঘটনা ঘটে গেল, তাতেও পাশ্চাত্যের কেউ তেমন ও উচ্চ-বাচ্য করল না। প্রশ্ন দাঁড়ায়, আজ যে কথাগুলো বলা হচ্ছে সেগুলো কি সত্যিই ন্যায়-নীতির খাতিরে, নাকি অন্য কোন বিশেষ কারণে? যা কিছুর ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে তার কারণ যদি সত্যি সত্যিই ইনসাফের জন্যে হয়ে থাকে, তাহলে 'ইনসাফ' তো একই দৃষ্টিতে সব কিছু বিচার করে। ইনসাফের মাপকাঠি কখনো বদলায় না। ভিন্ন ভিন্ন পাল্লায় তো ইনসাফ কায়েম করা যায় না।

কাশ্মীরে অত্যাচার ও নিপীড়নের ব্যাপারে নীরবতা কেন ?

একইভাবে এ কথাও ছড়ানো হয় যে, কতিপয় ইংরেজ বিমানবালাদের সাথে ইরাকের সেনারা অমানবিক ব্যবহার করে এবং তারা তাদের শ্লীলতাহানি করে। এরও তীব্র প্রতিবাদ করা হয়। কাশ্মীরে বিগত কয়েক মাস ধরে মুসলমান জনসাধারণ এবং দরিদ্র মহিলা ও শিশুদের উপর অমানবিক অত্যাচার চলছে। শ্লীলতাহানির ঘটনা এত বেশী ঘটছে এবং সেগুলি এতই নিদারুন যে, শুনে বা পড়ে মানুষ শিউরে উঠে। আহ! কি করে দুনিয়ায় এত পৈশাচিক, এত ভয়াবহ অত্যচার করা সম্ভব ! আমি প্রশ্ন করতে চাই, পাশ্চাত্যের কোন্ দেশ এ বিষয়ে হিন্দুস্থানের নিন্দা করেছে বা কোন্ পাশ্চাত্য সংবাদ মাধ্যমে এ কথাগুলো পৃথিবীর সামনে তুলে ধরেছে ? যেখানে প্রতিদিন এ ধরণের অত্যাচারের ও নারী নির্যাতনের ভুরি ভুরি ঘটনা ঘটছে আর ঘটে চলেছে — সে দিকে কারও ভ্রূক্ষেপ নেই। অন্যদিকে একটি তথাকথিত বিমানবালা সংক্রান্ত ঘটনা, যা ইরাকে ঘটেছে বলে রটনা করা হয়, সেটা নিয়ে এত আস্ফালন ও হৈ চৈ কেন ? এই হৈ চৈ শেষ হবার আগেই জানা গেল, ইরাকের তথাকথিত ঘটনাটি ছিল প্রকৃতপক্ষে একটি রটনা, একটি কাল্পনিক কথা।

ইসলামী ইনসাফের মাপকাঠিতে ইরাকও নির্দোষ নয়। কোন দেশে অন্য দেশের লোকদের অবস্থানকালে যদি সংশ্লিষ্ট

দেশগুলির মাঝে শত্রুতা বাধে, তাহলে ঐ বিদেশীদেরকে 'জিম্মী' বানানোর অনুমতি ইসলাম দেয় না। তাদেরকে দিয়ে কোন ধরণের সওদাবাজী নিষিদ্ধ, আর তাদের উপর কোন রকমের নির্যাতনও নিষিদ্ধ।

হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-এর সমগ্র জীবন এবং তাঁর জীবনের সকল যুদ্ধ এ বিষয়ে সাক্ষী যে, শত্রু-জাতির সাথে মুসলমান সৈন্যরা যুদ্ধে লিপ্ত অবস্থায় তাদের দেশে অবস্থানরত শত্রু দেশের লোকদের উপর কখনো সামান্য পরিমাণও অত্যাচার করেন নি। তারা সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। তারা যেভাবে চাইত, সেভাবেই থাকত। মুসলমানদের মাঝে একজনও তাদের উপর নির্যাতন করে নি। ইসলাম বরং শিক্ষা দেয়, যদি কেউ আশ্রয় প্রার্থনা করে, শত্রু জাতির সদস্য হলেও তাকে আশ্রয় দিতে হবে। কিন্তু ইরাক ইসলামের এই মহৎ শিক্ষাকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করতঃ ঘোষণা করেছে যে, ইরাক ও কুয়েতে বসবাসরত সমস্ত বৃটিশ এবং আমেরিকান নাগরিক সবাই অমুক অমুক হোটেলে একত্রিত হয়ে যান। তারা এ দেশ ত্যাগও করতে পারবেন না আর নিজের আবাস গৃহেও থাকতে পারবেন না। একইভাবে কিছু সংখ্যক মুসলিম দেশের নাগরিকদেরকেও ইরাক ত্যাগ করার অনুমতি দেয়া হচ্ছে না।

এ কথা স্পষ্ট যে, পরিস্থিতি যেভাবে এগোচ্ছে, তার কারণে আগামীতে বিদেশীদেরকে 'জিম্মী' হিসেবে ব্যবহার করা হবে। এ কাজটি ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী তো বটেই বরং

দুনিয়ার প্রচলিত শিষ্টাচারেরও পরিপন্থী। তাই প্রশ্ন হচ্ছে, ভদ্রতা কোথায়? মুসলিম দেশ হোক কিংবা অমুসলিম দেশ হোক, আজকের পৃথিবীর রাজনৈতিক অঙ্গনে কোন্ দেশকে আমরা তাক্ওয়ার মহান শিক্ষা অবলম্বনকারী বা ইসলামের নিম্নতম ন্যায়নীতি বাস্তবায়নকারী আখ্যা দিতে পারি? সর্বত্র গলদ।

এবার জাতি সংঘের অবরোধ সিদ্ধান্তের বাহানায় চারদিক থেকে ইরাককে ঘেরাও করা হয়েছে, যাতে ইরাকে কোন জিনিস প্রবেশ করতে না পারে এবং কোন জিনিস সেখান থেকে বেরও হতে না পারে। কিন্তু এ প্রসঙ্গে দু'টি বিষয়ে মারাত্মক-ভাবে বাড়াবাড়ি করা হয়েছে। প্রথমতঃ, জাতিসংঘ কখনো খাদ্য, পানীয় ও অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য সামগ্রীর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে নি। দ্বিতীয়তঃ, জাতিসংঘ কখনো ঘোষণা করে নি যে, বয়কটে যে দেশ অংশ নিতে চাইবে না তাকেও জোরপূর্বক অংশ নিতে বাধ্য করা হবে। অথচ এ দু'টি বিষয়ে আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ড প্রকাশ্যে বাড়াবাড়ি করছে। একদিকে ইরাকের বিরুদ্ধে তারা অভদ্রতার অভিযোগ আনছে, যা আমরাও স্বীকার করি। ইসলামী শিক্ষার আলোকে ইরাকের অনেক কার্যক্রম অভদ্রতা বটে। কিন্তু অন্যদিকে আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ড নিজেরাই এমন একটি অভদ্রতার কাজ করছে, যা অত্যন্ত ভয়ংকর, যদিও কুট নৈতিক ভাষায় এর ভয়াবহতা ততটা ধরা পড়ে না। প্রকৃতপক্ষে বাগদাদ সরকার শেষ পর্যন্ত যদি চার হাজার বৃটিশ আর কমবেশী দু'হাজার আমেরিকান 'জিম্মীদের' সবাইকে (আল্লাহ্ না

করুন) নৃশংসভাবে হত্যাও করে তথাপি সেই অপরাধের তুলনায় ইংরেজ ও আমেরিকানদের অপরাধ অনেক বেশী ভয়াবহ যা তারা ইরাকের বিরুদ্ধে করে চলেছে। কেননা এখন তাদের অত্যাচারের পরিধি জর্ডানকেও ঘিরে ফেলেছে। জর্ডানকেও তাদের যুলুমের লক্ষ্যস্থলে পরিণত করা হচ্ছে।

জর্ডানের প্রতি হুমকি ঃ

জর্দান সব সময়ে পাশ্চাত্যের বিশ্বাসভাজন ছিল। বরং জর্ডানের তাবেদারী কোন সময়ে লজ্জাকর পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। এই অঞ্চলে এই জর্ডানই পাশ্চাত্যের সবচেয়ে বেশী বিশ্বাসযোগ্য বন্ধু। এমনিতে সৌদী আরব জর্ডানের চেয়েও তাদের বেশী ঘনিষ্ঠ, কিন্তু তার কথা আলাদা। বস্তুতঃ সৌদী আরব ও আমেরিকার স্বার্থ অভিন্ন এবং এতই অভিন্ন যে, এরা নামে মাত্র ভিন্ন। সে কারণে সৌদী আরবের সাথে আমেরিকার কেবল স্বার্থই নয় বরং এর চেয়েও অনেক বেশী কিছু জড়িত। কিন্তু জর্ডান একটি ছোট দেশ যা সত্যিকার অর্থে যুগ যুগ ধরে পাশ্চাত্যের নির্ভরযোগ্য বন্ধুরূপে খ্যাত। ইংরেজদের সাথেও জর্ডানের বন্ধুসুলভ বরং ভ্রাতৃপ্রতিম সম্পর্ক, আর আমরিকার সাথেও তাই। আর আজ পর্যন্ত পাশ্চাত্যের নিজের রেকর্ডেও নির্ভরযোগ্য বন্ধুদের তালিকায় জর্ডানের নাম সবার উপরে। সমস্যা হল এই যে, যদি সে ইরাককে অর্থনৈতিকভাবে বয়কট করে, তবে সে নিজেও মরবে, তার জীবন যাত্রা আর চলবে না। পক্ষান্তরে, বয়কটের ফলে যদি ইরাক

জর্ডানের ওপর আক্রমণ চালায়, তাহলে জর্ডান কয়েক ঘণ্টাও টিকতে পারবে না। এটি জর্ডানের একটি দুর্বলতা। কিন্তু এই জর্ডানের দুর্বলতাকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করে, এখন পাশ্চাত্য জাতি তাকে যুলুমের লক্ষ্য স্থলে পরিণত করার মনস্থ করেছে। তাকে হুমকীর পর হুমকী দেওয়া হচ্ছে, "যদি ইরাকের বিরুদ্ধে অবরোধ সৃষ্টি করার কাজে তুমি আমাদের সাহায্য না কর, তবে আমরা তোমাকেও অবরোধের মাঝে ফেলব। যেহেতু এই অবরোধের মধ্যে খাদ্য দ্রব্যও অন্তর্ভুক্ত, সেজন্যে ইহা অগণিত মানুষকে ক্ষুধায় ও অনাহারে রেখে তিলে তিলে প্রাণে মারার একটি পরিকল্পনা। এর উদ্দেশ্য ইহাই যে, অবরুদ্ধ দেশগুলি যেন তাদের ন্যায্য কিংবা অন্যান্য সব ধরণের মতাদর্শ থেকে সম্পূর্ণ সরে গিয়ে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে পিছিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এখানেই শেষ নয়। এগুলি ছাড়া আরও অনেক অশুভ পরিকল্পনা এদের (পাশ্চাত্যের) রয়েছে, যা চিন্তা করলেও মানুষের আত্মা কেঁপে ওঠে।

পাশ্চাত্যের রাজনীতি ধোকাবাজীর চরম পর্যায়েঃ

এখন প্রশ্ন হ'ল ইনসাফ কোথায় পাচ্ছেন? পাশ্চাত্য 'ডিপ্লোমেসি' (কুটনীতি), যাকে ইসলামী পরিভাষায় دجال (দাজাল) বলা হয়, তারা সেই 'দাজাল' এর চরম শিখরে উপনীত হয়েছে। দুনিয়া সৃষ্টি অবধি কখনো 'দাজাল' এত উঁচু স্তরে উন্নীত হয় নি, যে স্তরে পাশ্চাত্য জাতি আজ তাকে 'ডিপ্লোমেসি' আর রাজনীতির নামে পৌঁছে দিয়েছে। তাই

তাদের অপরাধ ও অন্যায়গুলো সর্বদা পর্দার আড়ালে লুক্কায়িত থাকে, তাদের ভাষায় একটি আপাতঃ মাধুর্য লক্ষ্যণীয়। প্রপাগাণ্ডার মাধ্যমে নিজেদের কথা তারা এমন সুরে তুলে ধরে, যার কারণে কথার মধ্যে কিছু যুক্তিও বাহ্যতঃ পরিলক্ষিত হয়।

অনেক বিপদাদি এই মুহূর্তে প্রকাশ্যরূপেই আমাদের কাছে দেখা দিচ্ছে। আবার এমনও অনেক বিপদাদি আছে যা এখনও জনসাধারণের চোখে ধরা পড়ে নি, কিন্তু গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে সেগুলোও ধরা পড়বে। আমাদের একটি ছোট মাছের পুকুর ছিল। আমরা যখন তার ধারে যেতাম তখন প্রথম দৃষ্টিতে কেবল পানির স্তর নজরে পড়ত। তারপর পানির স্তরের কাছাকাছি যে মাছগুলো সাঁতার কাটতো সেগুলো চোখে পড়ত। কিন্তু যখন গভীর দৃষ্টি সহকারে দেখতাম তখন নীচের অন্য মাছগুলিও চোখে ধরা পড়ত যেগুলো প্রথম ও দ্বিতীয়বারের দৃষ্টিতে দেখা যায় নি। দুনিয়ার রাজনীতিও এখন এ রকমই। একটি হচ্ছে জনসাধারণের দৃষ্টি যা কেবল উপরের স্তরকে দেখে। কিছুক্ষণ পর, উপরে ভেসে উঠা মাছও নজরে পড়ে। কিন্তু যখন মোমেনের দৃষ্টিতে বিচক্ষণতার সাথে গভীরভাবে অবলোকন করা হয়, তখন পাতাল পর্যন্ত অবস্থা জানা যায়। এ দিক থেকে বলা যায়, এখনও আপনাদের সামনে অনেক বিপদ উন্মোচিত হয় নি, সময়ের সাথে সাথে সেগুলো প্রকাশ পাবে। অতএব, আমি দোয়া করি এবং এই দোয়ায় আপনাদেরকেও সঙ্গে

নিতে চাই যে, আল্লাহ্‌তা'লা যেন বিপদের এই কালো ছায়া ইসলামী বিশ্বের উপর থেকে সরিয়ে দেন। (আমীন)

কুরআনের আলোকে সমস্যার সমাধান ঃ

এ ঘটনায় মুসলমানদের এবং বিভিন্ন মুসলিম দলের প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও দুঃখজনক। আমি আমার আগের এক খুতবায় এ বিষয়টিকে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছিলাম। আর পত্রিকাতেও বিবৃতি দিয়েছিলাম। আমি সকল মুসলিম দেশের নেতাদের নামে সে সব দিক-নির্দেশনা দিয়েছিলাম সেই পয়গামের সারাংশ হচ্ছে এই যে, আপনারা কুরআন করীমের শিক্ষা বাস্তবায়নে এগিয়ে আসুন। কুরআন বলে ঃ

"হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র এবং আনুগত্য কর এই রসূলের এবং তাহাদের যাহারা তোমাদের মধ্যে আদেশ দেওয়ার অধিকারী। অতঃপর, যদি কোন বিষয়ে তোমরা মতভেদ কর, তাহা হইলে তোমরা উহা আল্লাহ্‌ এবং এই রসূলের প্রতি সমর্পণ কর, যদি তোমরা আল্লাহ্‌ এবং শেষ দিবসের উপর ঈমান রাখ। ইহা বড়ই কল্যাণজনক এবং পরিণামের দিক দিয়া অতি উত্তম" (সূরা নিসা, আয়াত ৬০)।

যখন তোমরা আপোষে মতবিরোধের সম্মুখীন হও, তখন সবচেয়ে নিরাপদ পন্থা হ'ল এই যে, তোমরা মীমাংসার জন্যে বিষয়টিকে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের কাছে পেশ কর।

কুরআন ও সুন্নত যেদিকে চলার পরামর্শ দেয় সেই দিকে চল। এরই মাঝে তোমাদের শান্তি ও স্থায়ীত্ব নিহিত। তাই বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে দলাদলি না করে, নিজেদের সমস্যা নিজেদের সীমিত বুদ্ধির আলোকে সমাধান না করে, কুরআনের শিক্ষার দিকে এস, আর ইহা তোমাদেরকে যে পন্থা জানায় তাথেকে শিক্ষা গ্রহণ কর। সে শিক্ষাটি হচ্ছে, মুসলমানদের কেবল একটা দল অপরটিকে সমর্থন করলে সমস্যার সমাধান হবে না। বরং সকল মুসলমান দেশ যেন মিলিতভাবে দু'টি মুসলমান দেশের মধ্যে মীমাংসা আনয়নের উদ্যোগ নেয়। তাদের মতে যে দেশ বাড়াবাড়ি করছে, তার উপর তারা সম্মিলিতভাবে চাপ সৃষ্টি করবে। অতঃপর, ইনসাফের সাথে উভয় পক্ষের কথা শুনে, আপোষ নিষ্পত্তির চেষ্টা করবে। তা সত্বেও যদি সন্ধি না হয়, আর এক দেশ অপরটির উপর আক্রমণ চালায়, তবে সব মুসলিম দেশ সম্মিলিতভাবে ঐ আক্রমণকারী দেশের মোকাবিলা করবে। এ প্রসঙ্গে পরজাতির সাহায্য নেওয়ার কোথাও উল্লেখ পাওয়া যায় না। যদি প্রথমেই এই শিক্ষার উপর আমল করা হত, তবে আজকের এই গুরুতর ও ভয়াবহ পর্যায় পর্যন্ত বিষয়টি কখনই গড়াত না। বরং সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পরিস্থিতি দেখা যেত।

কুরআন করীমের এই শিক্ষার আলোকে আমি মনে করি, বরং আমি সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করি, যদি এর উপর আমল করা হয়, তবে সমস্ত মুসলিম দেশ সম্মিলিত ভাবে একটি জেদী মুসলিম রাষ্ট্রের মোকাবিলায়, সে যত বড়ই হোক

না কেন, অবশ্যই চাপ প্রয়োগ করতে এবং জোরপূর্বক তার হঠকারিতা ভাঙ্গতে সক্ষম হবে। আর সক্ষমতা চিরকালই থাকবে। তা না হলে কুরআন কখনই এ শিক্ষা দিত না। অত্যন্ত স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে এ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আর নিশ্চয়তাও প্রদান করা হয়েছে যে, কোন ইসলামী দেশ ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করলে, যদি তোমরা (অর্থাৎ বাকী মুসলমানরা) কুরআন নির্দেশিত শিক্ষার আলোকে সমস্যার সমাধান করতে চাও, তাহলে তোমাদের সম্মিলিত শক্তি তাকে নতজানু হতে বাধ্য করবেই করবে। কুরআন চিরকালের জন্যে এই সুসংবাদ তোমাদেরকে দিয়েছে। যদি নীতি ও শিক্ষার উপর আমল করা হয়, তবে আজও এই শুভ সংবাদ সত্য বলে প্রমাণিত হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সৌদী আরব তার অভিভাবক অর্থাৎ আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডকে হস্তক্ষেপের নিমন্ত্রণ জানিয়েছে যার ফলে তাদের সৈন্য সেখানে পৌঁছাতে আরম্ভ করেছে। আর, এদের আমন্ত্রণ জানিয়েই সে ক্ষান্ত হয় নি। বরং অন্যান্য সব বড় বড় সরকারকে সেখানে কোন না কোন ভাবে অংশ নিতে হয় বাধ্য করেছে, নয় রাজী করিয়েছে। তদনুসারে ইউরোপ ও দূর প্রাচ্য থেকে এবং অন্যান্য দূরবর্তী দেশগুলো থেকেও কিছু নৌবহর কিংবা জঙ্গী বিমান অথবা সৈন্য সেখানে জড় হতে আরম্ভ করেছে, যাতে সারা পৃথিবী একদিকে এবং ইরাক ও তার দু'একটি সমর্থক দেশ আরেক দিকে থেকে যায়। এরপরও বলা হচ্ছে যে, সব কিছু সৌদি আরবের আত্মরক্ষা

মূলক পদক্ষেপ মাত্র! এতসব করেও বলা হচ্ছে, বিপদের সীমা রেখা টানা হচ্ছে, যেন তা বেশ দূর ছড়াতে না পারে। এর আরেকটি দিক হচ্ছে এই যে, বেশীর ভাগ মুসলিম দেশ বড় বড় রাষ্ট্রের চাপের মুখে বাধ্য হয়ে অথবা নিজ স্বার্থপরতার বশে সানন্দে সেখানে সৈন্য পাঠাতে সম্মত হয়েছে। এমন কি, পাকিস্তানের বোকামী দেখুন! সে ঐ সব দেশের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে যারা সৌদী আরবে সৈন্য পাঠানোর ওয়াদা করেছে—এমন সৈন্য বাহিনী যারা আমেরিকান ও বৃটিশ সৈন্যদের সাথে মিলিত হয়ে মুসলিম রাষ্ট্র ইরাকের বিরুদ্ধে লড়বে।

প্রকৃত আশঙ্কা ঃ

এই পরিস্থিতি ভয়ানক আকার ধারণ করে চলেছে। এসব পদক্ষেপ, এত আয়োজন কেবল সৌদী আরবকে ইরাকী আক্রমণ থেকে বাঁচানোর জন্যে করা হচ্ছে, এ কথা মনে করা চরম নির্বুদ্ধিতা হবে। এর চেয়ে বেশী বোকামী আর হতেই পারে না। যদি কেউ মনে করে যে, পৃথিবীময় এই বিরাট তোলপাড়, চারিদিক দিয়ে নৌ প্রতিবন্ধকতা ও অবরোধ সৃষ্টি করা হয়েছে। ভয়ঙ্কর ধরণের জঙ্গী উড়োজাহাজ যা পৃথিবীর কোন রণক্ষেত্রে আজ পর্যন্ত কখনো ব্যবহৃত হয় নি, সেগুলোও সেখানে পাঠানো হচ্ছে। তদুপরি, নব নব আধুনিক সমরাস্ত্র সেখানে জমা করা হচ্ছে। এসব কিছুই কি শুধু মাত্র সৌদী আরবকে ইরাক থেকে রক্ষা করার জন্যে? **আমার যা আশংকা তা হল এই, প্রথমে চারদিক থেকে**

ইরাককে কাবু করার পর ইস্‌রাঈলকে ইরাক আক্রমণ করার অনুমতি প্রদান করা হবে। জর্ডান বর্তমানে তার অপারগতার কারণে ইরাককে যে সমর্থন দিচ্ছে তা যদি দিতে থাকে তাহলে জর্ডানকে শাস্তি দিবার জন্যে পশ্চিমাদের কাছে একটি বড় বাহানা সৃষ্টি হবে এই যে, সে তাদের সাথে যোগ দিচ্ছে না। তার শাস্তি হবে এই, ইস্‌রাঈলতো আগ থেকেই জর্ডানের পশ্চিম তীর দখল করে রেখেছে, অনুরূপভাবে যতদূর পর্যন্ত সম্ভব জর্ডানের বাকী বিশাল এলাকাও ইহুদীরা দখল করে নিবে। পক্ষান্তরে ইরাকও দ্রুত যেটুকু অঞ্চল দখল করতে পারে সেটুকু দখল করে নিবে। এরপর চূড়ান্তভাবে ইরাককে প্রচণ্ড শাস্তি দেওয়া হবে।

এ প্রসঙ্গে, আশঙ্কা রয়েছে যে, কিছু দিন পর্যন্ত বর্তমান চাপ বৃদ্ধি করা হবে যাতে ক্ষুধায় নাজেহাল হয়ে, ইরাক নতজানু হতে বাধ্য হয়। অতঃপর, সুবিধামত কোন সময়ে এক ইঙ্গিতে ইস্‌রাঈলকে ইরাক আক্রমণ করার অনুমতি দেওয়া হতে পারে। আর এরা সবাই (পশ্চিমারা) বলতে পারে, 'আমরা তো মুসলমান সৈন্যদের সাথে সম্মিলিতভাবে কেবল সৌদী আরবের নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যে বসে আছি। ইরাক-ইস্‌রাঈল যুদ্ধের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক

নেই। আমাদের সৈন্য মোতায়েন প্রসঙ্গে সমস্ত মুসলিম বিশ্বের ঐক্যমত রয়েছে। আমরা তো কোন বাড়াবাড়ি করছি না। এটি সম্পূর্ণভাবে ইরাক আর ইস্‌রাঈলের নিজস্ব ব্যাপার। তারা নিজেরাই সমাধান করবে। আমরা হস্তক্ষেপ করব না। অন্যদিকে, যেহেতু মুসলমান সৈন্যরা সেখানে পশ্চিমাদের সাথে সম্মিলিতভাবে আটকে থাকবে সেজন্য তারা চাইলেও, ইস্‌-রাঈলের বিরুদ্ধে ইরাককে কোন সাহায্য করতে পারবে না।

যদি ঘটনা এভাবে নাও ঘটে, তবু সত্যি সত্যিই বড় বেশী আশঙ্কা রয়েছে যে, ইরাককে এমন প্রতিশোধমূলক শাস্তি দেওয়া হবে, যাতে সে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত এদের মনের প্রতিহিংসার আগুন না নিভে, যতক্ষণ পর্যন্ত এই এলাকার অসাধারণ শক্তিশালী এই মুসলিম দেশটি চিরতরে নিশ্চিহ্ন না হয়ে যায়, তারা প্রতিশোধ নিতেই থাকবে। এই বাসনা সবচেয়ে আগে ইস্‌রাঈলের মনে জেগেছে। ইস্‌রাঈলের বিবৃতিগুলো আমি নিয়মিত পড়ি। এসব বিবৃতি থেকে আমি নিশ্চিত যে, অনেক আগের থেকেই ইস্‌রাঈল একথাই প্রপাগাণ্ডা করে এসেছে এবং বার বার বলেছে যে, "ইরাক ইস্‌রাঈলের জন্য হুমকী স্বরূপ।" আজকের ঘটনা-বলী এই কথারই জের মাত্র। একমাত্র আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন, কিভাবে ইরাককে কুয়েত দখল করতে প্রলুব্ধ করা হয়েছিল যার ফলশ্রুতিতে সাম্প্রতিক ঘটনা প্রবাহ আরম্ভ হয়েছে। তবে একথা ঠিক যে, ঐগুলো অকস্মাৎ ঘটে যাওয়ার মত ব্যাপার নয়

বরং এর নেপথ্যে অনেক কারণ আর অনেক গভীর ষড়যন্ত্র কার্যরত থাকতে পারে। কোথাও 'সি আই-এ'র' এজেন্ট কাজ করছে ; কোথাও বা দেশের মধ্যেই বিশ্বাসঘাতকরা ধূর্ততার সাথে গোপনে গোপনে বড় বড় বিদেশী শক্তির পবিকল্পনা বাস্তবায়নে লিপ্ত। কুরআন করীম সূরা 'নাস'এ ধরণের কর্মকাণ্ডের উল্লেখ করে বলে, 'خناس' (খান্নাস) হ'ল সেই শক্তি যারা অশান্তির বীজ বপন করে পিছে সরে যায়। আর কেউ বুঝতেই পারে না যে, বিষয়ের উৎপত্তি কোথা থেকে হল বা কেন হল। এসব মারাত্মক বড় বড় ভুল ও বোকামীর জন্যে আসলে দায়ী কে? বস্তুত এগুলোর নেপথ্যে বড় বড় জাতি কর্মরত থাকে। এদিক দিয়েও পরিস্থিতি অতীব ভয়াবহরূপ ধারণ করছে।

ইসলামী বিশ্বের ঐতিহাসিক পটভূমি ঃ

আপনারা ইসলামী বিশ্বের ঐতিহাসিক পটভূমি আলোচনা করলে দেখতে পাবেন যে, কিছু সংখ্যক মুসলিম দেশের সক্রিয় সাহায্য ছাড়া, ইসলামের শক্তিকে কখনই নষ্ট করা সম্ভব হয় নি। ইসলামের সারাটা ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, যখনই পাশ্চাত্যের শক্তিগুলো মুসলমানদের শক্তি ও অগ্রগতি রোধ করেছে কিংবা বাহ্যিক বা গুপ্ত পন্থায় তাকে ধ্বংস করেছে, বা তার ক্ষতি সাধন করেছে, তখনই তারা কিছু মুসলিম দেশের সমর্থনেই সে কাজ সাধন করেছে। আমি অতি সংক্ষেপে সেই ইতিহাসের কয়েকটি ঘটনা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) الٓمٓر (আলিফ লাম মীম রা)-এর সংখ্যাগত মান পর্যালোচনাকালে প্রথম বারের মত এ কথা তুলে ধরেন যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন যে, এর গাণিতিক সংখ্যা (আবজাদ) ইসলামী ইতিহাসের সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত। আর অক্ষরগুলোর গাণিতিক যোগফল দাঁড়ায় ২৭১। হিজরী ২৭১ সন হচ্ছে ইসলামের প্রথম তিন প্রজন্ম গত হওয়ার বছর। প্রথম তিন প্রজন্ম-কাল সম্বন্ধে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুসংবাদ দিয়েছিলেন যে, এরা অর্থাৎ "আমার প্রজন্ম, তার পরের প্রজন্ম এবং তাদের পরের প্রজন্ম নিরাপদ ও সুরক্ষিত প্রজন্ম।" এদের সময়কাল কমবেশী ২৭১ হিজরীতে শেষ হয়। এই সেই ভয়াবহ বছর, যে সময়ে ইসলামী বিশ্বের পতন সূচিত হয়। ইসলামের পরবর্তী অনৈক্য আর বিপর্যয়ের এই বছর ২৭১ হিজরীতেই আরম্ভ হয়। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) ইসলামের ইতিহাসে এ বছরটিকে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ অঘটনের মাইল ফলকরূপে চিহ্নিত করেন। ২৭১ হিজরী সনে স্পেনের মুসলিম সাম্রাজ্য পোপের সাথে এমন একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয় যে, পোপ বাগদাদের মুসলিম সাম্রাজ্যকে যুদ্ধে পরাজিত ও ধ্বংস করতে স্পেনকে সমর্থন করবে। সে যুগে পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক অঙ্গনে পোপের অসাধারণ প্রভাব ছিল বরং এক দিক থেকে সে কারণে এটি অত্যন্ত ভয়ানক একটি চুক্তি ছিল। আজ যদি সৌদী আরব পশ্চিমা শক্তিদের সাথে

মিলিত হয়ে একটি ইসলামী রাষ্ট্রকে ঘটনাচক্রে (যার রাজধানীও সেই বাগদাদ) ধ্বংস করার চুক্তি করে, তবে সেটাও হবে স্পেনের মুসলিম শাসক ও পোপের মধ্যকার চুক্তির অনুরূপ। অপরদিকে ২৭২-৭৩ হিজরী সনে বাগদাদের মুসলিম সরকারও পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে রোমের সীজারের সংগে চুক্তি করে যে, তারা এক-যোগে মিলিতভাবে স্পেনের ইসলামী রাষ্ট্রকে ধ্বংস করে দিবে। সুতরাং এটি সেই বছর যা নিঃসন্দেহে পরবর্তীতে চিরকালের জন্য মুসলমানদের নিরাপত্তা হরণকারী ও পতনের দ্বার উন্মোচ-নকারী সন ছিল। এরপর হতে দেখা যায়, মুসলিম সাম্রাজ্যে বড় বড় ধরণের যে সব ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, তাতে অমুসলিম জাতির কারসাজি রয়েছে। তাদের ষড়যন্ত্রে কিছু সংখ্যক মুসলিম দেশ একে অপরের বিরুদ্ধে যোগ দিয়েছে।

হালাকু খান ১২৫৮ইং সনে বাগদাদকে ধ্বংস করে দেয়। তক্‌দীরই এ ধ্বংসের কাজ করিয়েছিল, নাকি অন্য কোন পরি স্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন। ইতিহাস থেকে প্রমাণিত যে, সর্বশেষ ও অত্যন্ত দুর্বল আব্বাসীয় খলীফা আল্‌ মুসতাসিম বিল্লাহর প্রধানমন্ত্রী বা কোন মন্ত্রী (আমার যতদূর মনে পড়ে সে সম্ভবতঃ প্রধান মন্ত্রীই ছিল) শিয়া সম্প্রদায়ের সদস্য ছিলেন। শিয়াদের প্রতি মুসতাসিমের নানা রূপ যুলুম অত্যাচারের কারণে সে মুসতাসিমের উপর ক্রুদ্ধ ছিল। এটি ঠিক কথা যে, মুসতাসিম যে যুলুম ও নিপীড়ন করেছিল, তা করার কোন অধিকার তার ছিল না। সেই প্রধানমন্ত্রী তার প্রতিশোধ

নিল। হালাকু খান নিজস্ব এলাকায় এক সফরে ছিল। বাগদাদের উপর আক্রমণ করতে সে ভয় পাচ্ছিল, পাছে যুদ্ধের ফলাফল মন্দ হয়। কিন্তু তাকে সেই মন্ত্রী পত্র দিয়ে জানাল যে, তুমি জান না যে, বাগদাদের দাপট কেবল মুখে মুখেই রয়ে গেছে। বাহ্যিক ঠাট-ফাট ছাড়া, তার তেমন শক্তি ও জন-সমর্থন নেই। দেশটি ভেতর দিয়ে একেবারে ফোকলা। অন্যদিকে সে কিছু পদক্ষেপও গ্রহণ করে। সে সেনাবাহিনীকে বিক্ষিপ্ত করে। সেনাবাহিনীতে অপ্রয়োজনীয় বহু বাড়তি সৈন্য রয়েছে বলে সে বাদশাহ্‌কে বুঝায়। সেনাদেরকে অতিরিক্ত বোঝা আখ্যায়িত করে বাদশাহ্‌র অনুমোদনসহ সৈন্য ছাঁটাই করে; সেনাবাহিনীর কোন কোন অংশকে এমন সীমানায় প্রেরণ করে যেখানে হামলার কোন আশঙ্কা ছিল না। এভাবে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ক্ষুন্ন করে, হঠাৎ হালকু খানকে আক্রমণের জন্যে নিমন্ত্রণ করে আনা হয়। তার আক্রমণে বাগদাদে যে ধ্বংসযজ্ঞের সৃষ্টি হয়, আর ইসলামী রাজত্বের যেভাবে ইতি ঘটে, তার বিশদ ব্যাখ্যার এখন সুযোগ নেই। বেশীর ভাগ লোকেই এ ঘটনা শুনে থাকবেন। এ বিষয়ে অনেক উপন্যাসও রচিত হয়েছে। যাইহোক, এটি দুনিয়ার অত্যন্ত বিখ্যাত একটি ঐতিহাসিক ঘটনা যা হিজরী ৬৩৭ সনে ঘটে। তখনও একটি মুসলিম রাষ্ট্রের কয়েকজন মুসলমান পরজাতির সাথে ষড়যন্ত্র করে বাগদাদের উপর হামলা করিয়েছে।

এরপর তৈমুর লং-এর দ্বারা ১৩৮৬ইং সনে বিরাট ধ্বংস সাধিত হয়। তখনও মুসলমানদের মুনাফেকী আর অনৈক্যের

কারণে তৈমুর লং নতুন করে আরেকবার বাগদাদ সাম্রাজ্য সম্পূর্ণ তছনছ করার সুযোগ লাভ করে। তৃতীয় বারের মত, তুর্কীদের হাতে ১৬৩৮ইং সনে বাগদাদ সরকারের পতন ঘটে। তুর্কীরা নিজেরা মুসলমান হয়েও অপর একটি মুসলিম সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এরপর, ইংরেজরা সৌদী আরবের বর্তমান ক্ষমতাসীন রাজবংশ ও বর্তমান সরকারী ইসলামী সম্প্রদায়ের সাহায্যে তুর্কী সাম্রাজ্যের পতন ঘটায়। সে সময় 'কুয়েত' তাদের বিশেষ সহযোগী ছিল (এই কুয়েতের উপরই ইরাক এবার হামলা করেছে)। তাদের সাহায্য ছাড়া অর্থাৎ সৌদী আরবের বর্তমান ক্ষমতাসীন রাজবংশ আর তাদের গোত্র এবং ওয়াহাবী সম্প্রদায়ের সহযোগিতা ছাড়া, সেই সঙ্গে কুয়েত বসবাসকারী গোত্রগুলোর সমর্থন ব্যতীত ইসলামী বিশ্ব থেকে তুর্কী রাজত্বকে কোনও মতেই মেটানো যেত না। তুর্কীর বিরুদ্ধে আরব জাতীয়তাবাদের দোহাই তোলা হলো। তুর্কী বিরোধী কার্যকলাপকে বাহির থেকে উৎসাহিত করা হল। আরও অনেক কিছু করা হল। সে এক বিরাট কাহিনী! এক বহিঃশক্তি (ইংরাজ জাতি) কতিপয় মুসলমানদেরই মাধ্যমে মুসলমানদের একটি বড় রাজত্বকে এভাবে বিনষ্ট করে দিল। প্রথমে তুর্কী বাগদাদের রাজত্ব বিনষ্ট করে। আর তারপরে কুয়েত ও সৌদী আরবের এলাকায় বসবাসকারী গোত্রগুলির সাহায্যে তুর্কী রাজত্বকে ধ্বংস করা হয়।

আজ পুনরায় একই ধরণের পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে। আজ আবার সৌদী আরব ও তার আশে পাশের মুসলিম

রাষ্ট্রগুলির উপর ভর করে, বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহ, একটি বড় ইসলামী রাষ্ট্রকে চরম বিপদের সম্মুখীন করেছে। আমার আন্দাজে এরা (পশ্চিমারা) ফয়সালা করে ফেলেছে যে, এবার ইরাককে এমন কঠোর শাস্তি দিতে হবে যাতে আগামীতে যুগ যুগ ধরে কোন মুসলমান রাষ্ট্র আর মাথা চাড়া দিতে না পারে। এমন কি, তাদের কবল থেকে মুক্তির স্বপ্নও যাতে আর না দেখে।

**** ইরাকের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় উস্কানীদাতা হ'ল ইস্‌রাঈল ঃ**

বর্তমান পরিস্থিতির অন্তরালে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রয়েছে ইস্‌রাঈলের। সে অনেক আগ থেকেই চিল্লাচ্ছে, সে নাকি ইরাকের পক্ষ থেকে রাসায়নিক হামলার হুমকীর সম্মুখীন। ইস্‌রাঈলীরা প্রপাগাণ্ডা করে যাচ্ছে যে, তাদের দেশটি এম্নিতেই একটি ছোট দেশ। তার উপর ইরাক রাসায়নিক বোমার আক্রমণ চালালে তারা নাকি দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। যে আশঙ্কার কথা বলা হয়েছে, তা সত্যি হোক বা মিথ্যাই, হোক,একথা প্রমাণিত সত্য যে, এই পরিস্থিতি সৃষ্টির নেপথ্যে সবচাইতে বড় ভূমিকা ইস্‌রাঈলের, তার অনেকগুলো স্বার্থ জড়িত। মনে হচ্ছে এখন সমগ্র ইসলামী বিশ্ব যেন ইস্‌রাঈলেরই স্বার্থ রক্ষার্থে এগিয়ে এসেছে।

পক্ষান্তরে, একটি ইসলামী রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ কথা ঠিক যে, ইরাকের কয়েকটি কর্মকাণ্ড

অবশ্যই ইসলাম বহির্ভূত যা যুলুমের পর্যায়ে পড়ে। সে কাজগুলি তাক্ওয়া ও ন্যায়-নীতি বিবর্জিতও। কিন্তু তাই বলে তাকে চিরতরে ধ্বংস ও নিঃশেষ করে দেওয়ার শাস্তি তো দেওয়া যায় না। অধুনা, সারা পৃথিবীতে ইনসাফ বিবর্জিত কার্যকলাপ চলছে এবং এর চেয়েও অনেক বেশী অন্যায় চলছে। অথচ কোন পরাশক্তি সে দিকে ভ্রূক্ষেপ পর্যন্ত করে না। অতএব, ইরাকের বিরুদ্ধে তারা আজ যা করছে তা ইনসাফের জন্যে নয় বরং গভীর শত্রুতা চরিতার্থ করার জন্যে তা করা হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, এরা অনেক ঋণ পরিশোধ করতে চায়। যদিও বাহ্যতঃ এই হামলা গয়ের-ইসলামী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত একটি ইসলামী দেশের বিরুদ্ধে, তথাপি প্রকৃতপক্ষে এটি ইসলামের উপর আক্রমণ। এই শত্রুতার শিকড় অত্যন্ত গভীর এবং তা ঐতিহাসিক। অনেক উচ্চ পর্যায়ে এই ফয়সালাগুলো করা হয়েছে। কারণ, বর্তমানে সমগ্র পৃথিবীতে ইরাক সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে। এর সুযোগ দান করা হলে, অচিরেই হয়তো সে আশে পাশের সমস্ত রাষ্ট্রগুলোকে নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে একটি ঐক্যবদ্ধ মুসলিম ফ্রন্ট গড়ে তুলতে পারে। সেই মুসলিম ফেডারেশনে পৃথিবীর তেল ভাণ্ডারের পর্যাপ্ত অংশ থাকবে। আর অর্থনৈতিকভাবে সে দেশগুলো সব বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বনির্ভর হওয়ার ক্ষমতা রাখবে। তারপরে সে অসাধারণ সামরিক শক্তির রূপ নিতে পারবে। এই হচ্ছে (পশ্চিমাদের) আশংকা। তাদের

আশংকা যাই থাক না কেন, আজ সবচেয়ে বড় আশংকা মুসলমানদের চোখেই পড়া উচিত। তা হচ্ছে এই যে, আজ ইসলামী বিশ্বের সমর্থন ও সাহায্যপুষ্ট হয়ে একটি শক্তিশালী উন্নয়নশীল ইসলামী দেশকে ধরা থেকে মুছে দেওয়ার পরিকল্পনা রূপায়নের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে, যদিও এজন্য স্বয়ং সে দেশের নেতৃবৃন্দই আপাততঃ দায়ী।

ইরাকের কি করণীয়ঃ

এ পর্যায়ে কি পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে? আমি মনে করি পরিস্থিতি আয়ত্তে আনার সময় এখনো সম্পূর্ণভাবে হাতছাড়া হয় নি। মুসলমানদের জন্যে শান্তির একটিই পথ। আর তা হচ্ছে আল্লাহ্ ও রসূলের শিক্ষা অনুসরণ করা। ইরাকের জন্যে সর্বপ্রথম কথা হচ্ছে এই ইসলামী শিক্ষাকে সে যেন আর ভুলুণ্ঠীত না করে। ইসলামকে হাসি তামাসা করার নূতন কোনও সুযোগ যেন বিশ্ববাসীকে না দেয়। প্রথম, ইরাকে অবস্থানরত আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড কিংবা পাকিস্তান ও অন্যান্য দেশের সমস্ত লোকদেরকে সম্পূর্ণ মুক্তি দিয়ে দাও। তাদেরকে বল যে, তোমরা যেখানে খুশী যাও, আমরা তোমাদেরকে বাধা দিব না। তোমার সরকারের সাথে বোঝাপড়া করব বা অন্য ব্যবস্থা নিব। কিন্তু তোমরা আমাদের দৃষ্টিতে নির্দোষ ও আমাদের কাছে আমানত স্বরূপ। ইসলামী শিক্ষানুসারে প্রত্যেক বিদেশী যে দেশের নাগরিক, সে দেশের সাথে

যুদ্ধ বাঁধলেও, ঐ নাগরিকরা আমানতই থাকে। ইরাক যদি এই আমানতের খেয়ানত করে, তবে তার ফল হবে ভয়াবহ। তাদের প্রতিশোধের আগুন যা পূর্ব হতেই দাউ দাউ করে জ্বলছে, তা বেড়ে গিয়ে লাখ লাখ নিরপরাধ মুসলমান সাধারণকে পুড়িয়ে ছাই করে দিবে। রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে মাত্র গুটি কতক মানুষ নিয়োজিত থাকে অথচ আগুন জ্বলে উঠলে, নির্দোষ মুসলিম জনসাধারণই বেশী মারা পড়বে। যুদ্ধকালেও তারাই মরবে। আবার যুদ্ধ শেষে তাদেরকেই প্রতিহিংসার লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত করা হবে। তাই বর্তমান পরিস্থিতিতে তাক্ওয়ার আলোকে ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়ন না করলে, ইরাকের জন্যে শান্তির পথ উন্মোচিত হতেই পারে না।

শান্তির পথ অবলম্বনের দ্বিতীয় পদক্ষেপ হবে সমস্ত ইসলামী বিশ্বকে পয়গাম দেওয়া যে, আমি (ইরাক) তোমাদের যে কোন সম্মিলিত রায় মেনে নিতে প্রস্তুত এবং কুয়েত থেকে নিজের সৈন্য ফেরত আনার ও সেখানে শান্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠার সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা দিচ্ছি; তবে এক শর্তে। শর্তটি হল — ইসলামী বিশ্বই এই ফয়সালা করবে। এই মীমাংসার কাজে বহির্জাতিদের অন্তর্ভুক্ত করা চলবে না। জোরেসোরে এই ঘোষণা দিতে হবে। ইরানের সাথে সন্ধিকালে ইরাক যেভাবে দখলকৃত ইরানী ভূমি ইরানকে ফেরৎ দিয়েছে, তেমনিভাবে তার কুয়েতও ছাড়া উচিত হবে। লক্ষ লক্ষ মানুষ

যে দীর্ঘ যুদ্ধে হতাহত হয়েছে, সেই যুদ্ধে প্রাপ্ত অঞ্চল যদি ফিরিয়ে দেয়া সম্ভবপর হয়ে থাকে তাহলে কুয়েতের ক্ষেত্রে রক্ত ক্ষয়ের পূর্বেই এ কাজটি কেন সম্ভব হবে না? অবশ্যই সম্ভব। সুতরাং ইরাক কুয়েত ছেড়ে দিক। আর ইসলামী বিশ্বকে বলুক, যেভাবে আমি ইরানের সাথে সন্ধি করেছি, এখন ইসলামের শত্রুর পাঁয়তারা বানচাল করার উদ্দেশ্যে, তার যুলুম থেকে রেহাই পাওয়ার নিমিত্তে, আমি তোমাদের সবার সাথে সন্ধি করতে চাই। কেননা, তাদের অত্যাচার প্রকৃতপক্ষে কেবল আমার উপর হবে না বরং সমগ্র মুসলিম জাহানের উপর হবে। যার ফলে, ইসলামের শক্তি কয়েক যুগের জন্যে একদম নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর মুসলিম দেশগুলোকে এমনভাবে টুকরো টুকরো করে দেয়া হবে, যেন তারা আজীবন সম্পূর্ণরূপে পরনির্ভরশীল হয়ে থাকে। কি ভয়ংকর মেঘ গর্জন হচ্ছে। কি মারাত্মক বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্ছে! ভাই ইরাক! তুমি দেখতে পাচ্ছনা। আমি ভেবে আশ্চর্য হই, কেন এরা এসব দেখতে পাচ্ছে না। আকাশ ছাওয়া বিজলীর চমকানী আর ঘন ঘোর মেঘের গর্জন, না তারা দেখতে পাচ্ছে, না তারা শুনতে পাচ্ছে! তাদের মনে কোন আশংকাই জাগছে না। বোকারা দু'দলে বিভক্ত হয়ে, একে অপরের মোকাবিলায় প্রস্তুতি নিচ্ছে। সুতরাং ইরাক যেন মুসলিম বিশ্বকে এই পয়গাম অবশ্যই দেয় এবং বার বার তা যেন রেডিও এবং টেলিভিশনের ঘোষণার মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বকে জানানো হয়। হে ইরাক!

তুমি উচ্চ নিনাদে বল, "আমরাআমাদের ভুল স্বীকার করছি, আমরা মুসলিম বিশ্বের আদালতের ফয়সালা মেনে নিব। কিন্তু বাইরের লোকদের এতে হস্তক্ষেপ করতে দিব না!"

এই আবেদনের ফলশ্রুতিতে বিশ্বের মুসলিম জনসাধারণ ইরাকের পক্ষে এত তীব্রতার সাথে রায় দিবে যে, এর কারণে যে দেশগুলো কুমতলবে বহিঃশক্তির সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ট করে চলেছে, তারাও এই আবেদনকে যথাযথ মর্যাদা ও গুরুত্ব দিতে বাধ্য হবে। আর যদি তারা সদুত্তর নাও দেয়, আর আবেদনটি যদি খোদার জন্যে তাঁর মহান শিক্ষাকে সমুন্নত রাখার খাতিরে হয়, তাহলে আল্লাহ্‌তা'লা স্বয়ং ইরাকের জামিন হবেন এবং অবশ্যই তিনি ইরাককে সমূহ বিপদাদি থেকে রক্ষা করবেন, যা এখন তার মাথার উপর ঘুরপাক খাচ্ছে। এটি আমার একটি নিঃস্বার্থ আবেদন; একটি বিনীত উপদেশ। যদি কেউ এই নিবেদন শ্রবণ করে, বুঝার চেষ্টা করে এবং গ্রহণ করে, তার অবশ্যই উপকার হবে। কেননা যা আমি তুলে ধরলাম তা কুরআনের শিক্ষা মাত্র। আর হঠকারিতা ও অহংকারবশতঃ সে যদি এই উপদেশ অগ্রাহ্য করে, তবে আমি বলে রাখছি, এত ভয়ানক বিপদ ইসলামী বিশ্বের উপর আসবে, যার ফলে সুদূর ভবিষ্যত পর্যন্ত সমস্ত ইসলামী বিশ্ব হায়-হুতাশ করবে, কাঁদবে, আর কেবলই দেয়ালে মাথা ঠুকবে, কিন্তু তখন করার কিছু থাকবে না, বা কিছু করাও যাবে না। আজ ইসলামী জগতের যে শক্তি ও ভাবমূর্তি পৃথিবীতে

প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে বা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, তা একবার ধূলিস্যাত হলে, শত চেষ্টায়ও আর পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে না। সত্যি বলতে, ইসলামী বিশ্ব আজ এমন এক পর্যায়ে আছে যে, যদি সে হৈ চৈ ও অশান্তি সৃষ্টি না করে চুপচাপ এগিয়ে যেতে থাকে, তবে আগামী দশ পনর বছরের মধ্যে সে এমন এক শক্তিতে রূপান্তরিত হবে, যার দিকে অন্যরা চোখ তুলে তাকাতে পারবে না; তাকাতে চাইলেও পারবে না। পক্ষান্তরে, যদি আজ বিশ্ব মুসলিম, কুরআনের পন্থা ছেড়ে, মনগড়া ভুল পদক্ষেপ নেয়, তবে অবনতির এমন অতল গহ্বরে ছিট্‌কে পড়বে যাথেকে ফেরত আসা আর সম্ভব হবে না।

ইসলামী বিশ্বের জন্যে দোয়ার আবেদন ঃ

এই সঙ্গে আমি জামা'তকে বলব, তারা যেন বিগলিত চিত্তে মুসলিম দেশগুলোর জন্যে দোয়া করেন। মুসলিম দেশগুলো আমাদের উপর যেসব অত্যাচার করেছে, বা আগামীতে করবে, তা আমার জানা আছে। তবে এটি তাদের ব্যাপার; তারা নিজেরাই আল্লাহ্‌কে এর জবাব দিবে। আমি আগেও বলেছি আর বলতেই থাকব যে, প্রকৃত অর্থে আমরাই ইসলামের নিষ্ঠাবান সেবক এবং ইসলামী মূল্যবোধের ধারক ও রক্ষক। ইসলামী শিক্ষার আলোকে কোন ইসলামী দেশের ভুল ত্রুটি তুলে ধরে তাকে সংশোধন করার অনুরোধ জানাতে আমরা ভয় করি না। এর ফলশ্রুতিতে সে যদি আমাদের শত্রু

হয়ে যায়, আর পরবর্তীতে প্রতিশোধমূলক কার্যকলাপ চালায়, সে বিষয়ে আমরা কোন পরওয়া করি না। কেননা আমাদের সমস্ত কার্যকলাপ সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র জন্যেই। আজ যদি ইসলামী জগতের জীবন আল্লাহ্‌তা'লা ও তাঁর রসূল হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সুন্নতের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে, তবে আমাদেরকেই তার হিফাযত করতে হবে। আর এই শিক্ষার হিফাযতের জন্যে সারা পৃথিবীর আহ্‌মদীগণ সব ধরণের ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত। সত্য কথা বলতে আমরা দ্বিধা করব না, আর উচিত কথা বলাতে দুনিয়ার কোন শক্তি যদি রাগ করে, তবে করুক। আমাদের আশ্রয় আমাদের খোদা। আমরা সম্পূর্ণভাবে তাঁরই উপর ভরসা রাখি। পৃথিবীর রাজনীতিকে আমরা মোটেই ভয় করি না।

এ প্রসঙ্গে আপনাদেরকে আমি একটি সুসংবাদ দিতে চাই। আজকে আমি যে নসিহত করলাম, এই নসিহত করার কাজটি আমার জন্যেই নির্ধারিত ছিল। আল্লাহ্‌তা'লা আজ থেকে বহু আগেই এর ফয়সালা করে রেখেছিলেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) তাঁর 'হামামাতুল বুশরা' পুস্তকে লিখেছেন,

بشرنی ربی فی العرب ان اسوذهم و اری طریقهم
و اصلح شئونهم ....

অর্থাৎ 'আমার রব আরবদের বিষয়ে আমাকে সুসংবাদ দিয়েছেন, যেন আমি তাদের তদারকি করি, তাদের সঠিক পথ

দেখাই এবং তাদের অবস্থার সংশোধন করি। এবং আল্লাহ্ চাইলে আপনি আমাকে একাজে সফল ও স্বার্থক হতে দেখবেন।'

আল্লাহ্‌তা'লা হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর উপর যে দায়িত্ব ন্যাস্ত করেছিলেন, তাঁর সামান্য দাস ও অনুসরণকারী হিসেবে, তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে আমি সেই দায়িত্ব সম্পাদন করছি। আমি এই ঐশী সুসংবাদের আলোকে সমস্ত ইসলামী বিশ্বকে এই খুশীর খবরটি দিতে চাই যে, যদি তারা আমার এই বিনীত নিবেদনগুলোর উপর আমল করেন তবে তারা নিঃসন্দেহে সাফল্যমণ্ডিত হবেন; ইহলোকেও উন্নতি লাভ করবেন এবং পরলোকেও উত্তম পুরস্কার লাভ করবেন। কিন্তু যদি তারা অস্থায়ী সুবিধাসমূহের খাতিরে ইসলামের স্বার্থ পরিত্যাগ করেন, আর ইসলামী শিক্ষাকে অবজ্ঞা করেন, তবে তাদেরকে দুনিয়ার কোন শক্তি আল্লাহ্‌র ক্রোধ থেকে বাঁচাতে পারবে না। ইসলামী বিশ্বের পক্ষ থেকে আল্লাহ্ যেন আমাদের প্রশান্তি দান করেন। আমাদের হৃদয় তাদের দ্বারা যেন আনন্দে ভরিয়ে দেন। আজ যে দুশ্চিন্তা আর উৎকণ্ঠায় আহ্‌মদীরা দিন কাটাচ্ছে সে অবস্থা যেন দূরীভূত করে দেন।

(১৭ই আগষ্ট '৯০ তারিখে
লণ্ডনস্থ মসজিদে ফযলে প্রদত্ত জুমুআর খোৎবা)